সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ: গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

« باللغة البنغالية »

د/ محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ: গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহান আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে খিলাফতের এক সুন্দর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানাদিকে সর্বপ্রথম এ দায়িত্ব দেয়া হয়। আদম আলাইহিস সালামের সন্তান হাবিলের কুরবানী কবুল হওয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧ ﴾ [المائدة: ٢٧]

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের নিকট হতেই (সৎকর্ম) কেবল গ্রহণ করেন।[1]

মূলত: মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণ করার এক মহান দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টির শুরু হতে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতদেরও প্রেরণ করা হয়েছে। তাই তো পবিত্র কুরআন

[1] সূরা আল-মায়িদাহ:২৭।

সাধারণভাবে সকল উম্মতের অন্যতম দায়িত্ব ঘোষণা দিয়ে বলেছে:

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾

[ال عمران: ١١٠]

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করবে।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

অতএব আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মহান দায়িত্বটি আঞ্জাম দেয়ার মাঝে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি; বরং তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে। যাঁরা স্ব-স্ব জাতিকে সৎ

ও কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং অসৎ ও অকল্যাণকর কাজ হতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل:٣٦]

“নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করবে”[2]।

এখানে তাগুত বলতে আল্লাহবিরোধী শক্তি, শয়তান, কুপ্রবৃত্তি এক কথায় এমন সব কার্যাবলীকে বুঝানো হয়েছে যা সুপ্রবৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে বাধা হয়।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে হেদায়াতের মশাল

---

[2] সূরা আন-নাহল:৩৬।

হিসেবে যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রদান করা হয়েছে তার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে অন্ধকার থেকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে, কুফরীর অন্ধকার হতে ঈমানের আলোর দিকে আহ্বান জানানো। আল্লাহ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١ ﴾ [ابراهيم: ١]

“আলিফ-লাম-রা, এ হচ্ছে কিতাব, আমরা তোমার প্রতি তা নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে ধাবিত করতে পার, এমন পথে যা প্রবলপরাক্রমশালী, প্রশংসিতের।”[3]

এ প্রথিবীতে মানুষের যাবতীয় কর্মকে যদি শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাহলে তা হবে ক) সৎকাজ (খ) অসৎকাজ। আর আখেরাতে

[3]সূরা ইবরাহীম:১।

এ দু'শ্রেণীর কাজের জবাবদিহি ও প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨ ﴾

[الزلزلة: ٧، ٨]

"যে অনু পরিমাণ ভাল করবে সে তার প্রতিদান পাবে আর যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তার প্রতিদান পাবে।"[4]

অতএব প্রতিদান দিবসে সৎকাজের গুরুত্ব অত্যাধিক। ফলে প্রত্যেকের উচিত সৎকাজ বেশী বেশী করা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা।

কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ মানুষের এসব কাজ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ۝١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ۝١٣ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ۝١٤ يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ ۝١٦ وَمَآ

[4] সূরা যিলযাল:৭-৮।

أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٨ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩ ﴾ [الانفطار: ١١- ١٩]

"সম্মানিত লেখকবৃন্দ, তারা জানে তোমরা যা কর, নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণরা থাকবে খুব স্বাচ্ছন্দে, আর অন্যায়কারীরা থাকবে প্রজ্বলিত আগুনে, তারা সেখানে প্রবেশ করবে প্রতিদান দিবসে, আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না, আর কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? তারপর বলছি কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? সেদিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোনো ক্ষমতা রাখবে না, আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে।"[5]

পৃথিবীতে মানুষ ধোঁকা প্রবণ, দুনিয়ার চাকচিক্য ও মোহে পড়ে অনন্ত অসীম দয়ালু আল্লাহর কথা স্মরণ থেকে ভুলে যেতে পারে। সেজন্যে প্রত্যেক সৎ কর্মপরায়ণের উচিৎ পরস্পর পরস্পরকে

[5] সূরা ইনফিতার:১১-১৯।

সদুপদেশ দেয়া, সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। মহান আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেন-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ۝٦ ﴾ [الانفطار: ٦]

“হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে?”[6] শুধু ধমক দিয়েই ক্ষ্যান্ত হন নি; বরং পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আত-তাহরীমে এসেছে-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۝٦ ﴾ [التحريم: ٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশ্‌তাকূল, যারা আল্লাহ

[6] সূরা ইনফিতার:৬।

তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তাই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।”[7]

অতএব বলা যায় যে, বিভিন্নভাবে এ পৃথিবীতে মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো পারস্পারিক সৎ ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা ও অসৎ এবং গুনাহের কাজ বর্জন করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾ [المائدة: ٢]

“তোমরা পূণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘণের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।”[8]

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরস্পরের সাথে সাক্ষাত হলে এ মহতি কাজটির কথা স্মরণ করে দিতেন। সেজন্য তাদের কেউ কেউ অধিকাংশ সময় মজলিশ হতে বিদায় বেলায় ও প্রথম

[7] সূরা আত তাহরীম:৬।

[8] সূরা আল মায়িদাহ:২।

সাক্ষাতে সূরা আছর তেলাওয়াত করতেন বলে কোনো কোনে বর্ণনায় এসেছে[9]। আল্লাহ বলেন-

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر: ١، ٣]

“সময়ের কসম, নিশ্চয় আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”[10]

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ রাসূলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ গুণের পথিকৃত ছিলেন। তিনি নবুওয়তের পূর্বে অন্যায় অবিচার রুখতে হিলফুল

---

[9] তবে বর্ণনাটি দুর্বল।

[10] সূরা আল আছর”১-৩।

ফুযুলে অংশ নিয়েছেন। ছোট বেলা থেকে মৌলিক মানবীয় সৎ গুণাবলী তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠায় আল-আমিন, আল সাদিক উপাধিতে তিনি ভুষিত ছিলেন। তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"তিনি সৎকাজের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন। মানবজাতির জন্য সকল উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করেন এবং খারাপ বিষয়গুলো হারাম করেন।"[11]

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর রিসালাতের পূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সত্ত্বা, যাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন, তাকে পাঠানো হয়েছে যাতে তিনি সৎকাজের আদেশ দেন, সকল অসৎ কর্ম হতে বারণ

---

[11] সূরা আল আরাফ: ১৫৭।

করেন, সব উত্তম বিষয় হালাল করেন এবং অপবিত্রগুলো হারাম করেন। এজন্যে রাসূল নিজেও বলেছেন-

«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»

“আমি সকল পবিত্র চরিত্রাবলী পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।”[12]

শুধু তাই নয় মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি ‘হিসবা’ নামক একটি বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ কাজটি আঞ্জাম দিতেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এ বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ হতে মানুষকে বারণ করা।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা মুমিনের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত

---

[12]ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ৫/২৫১।

সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা দান মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। মুমিন নিজে কেবল সৎকাজ করবে না, বরং সকলকে সে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে হবে। কেননা, তারা পরস্পরের বন্ধু। অতএব একবন্ধু অপর বন্ধুর জন্য কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

"মুমিন নারী ও পুরুষ তারা পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক যাদের প্রতি অচিরেই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।”[13]

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মুমিনের অন্যতম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সকল স্থানে অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি অন্যতম গুণ হিসেবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অবতারণা করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে:

﴿ ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَـٰبِدُونَ ٱلۡحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١٢ ﴾ [التوبة: ١١٢]

“তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহর গোলামীর জীবন-যাপনকারী। তাঁর প্রশংসা উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত। সৎ কাজের

---

[13]সূরা আত তাওবা: ৭১।

আদেশ দানকারী, অন্যায়ের বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী। হে নবী, তুমি এসব মুমিনদের সুসংবাদ দাও।”[14]

দীন হলো কল্যাণ কামনা

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দান দীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মূলত: দীন হলো পরস্পরের কল্যাণ কামনা। আর এটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ব্যতীত অসম্ভব। কারণ সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করলে পরস্পর কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। আবার অসৎ কাজে বাধা দিলে ক্ষতি থেকে বিরত রাখা সহজ হয়। অতএব এটি দীনের অন্যতম মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«الدين النصيحة.قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

---

[14] সূরা আত তাওবা:১১২।

দীন হলো মানুষের কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম এটা কাদের জন্য? রাসূল বললেন, এটা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্য।”

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ দীনের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে। মহান আল্লাহ যাবতীয় হালাল ও বৈধ বস্তুকে সৎকাজের নামান্তর এবং অবৈধ জিনিসকে অসৎ কাজ হিসেবে বারণ করার অধীন করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের উম্মতের উপর কতক বৈধ জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করতেন। কুরআনে এসেছে-

﴿ فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ ﴾ [النساء: ١٦٠]

“অতএব ইয়াহূদীদের যুলুমের কারণে তাদের উপর এমন কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্য হালাল ছিল।”[15]

[15] সূরা আন নিসা: ১৬০।

অথচ তাদের উপর এসব হারাম ছিল না। পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াত এর সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ ﴾ [ال عمران: ٩٣]

"প্রত্যেকটি খাদ্য দ্রব্যই ইসরাইল বংশীয়দের জন্য হালাল ছিল, শুধু ঐ জিনিসটি ব্যতীত, যা ইসরাইল (ইয়াকুব) স্বয়ং নিজের উপর অবৈধ করে নিয়েছিল।"[16]

কোনো খারাপ জিনিস অবৈধ করা অসৎ কাজ হতে নিষেধ করারই অন্তর্গত। যেমনিভাবে পবিত্র জিনিসটা বৈধ করাও সৎ কাজে আদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কেননা, উত্তম জিনিসকে অবৈধ করা, আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তারই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে সকল সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উন্নত চরিত্রের

---

[16]সূরা আলে ইমরান: ৯৩।

পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন। আল্লাহ রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন-

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾ [المائدة: ٣]

"আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন ইসলামকে একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"[17]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা অপরিহার্য

জাতিকে সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করা ওয়াজিব-ই- কিফাইয়াহ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'ইরশাদ করেছেন:

[17]সুরা আল মায়িদাহ:৩।

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ ﴾ [ال عمران: ١٠٤]

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি জাতি হওয়া উচিত যারা সকল ভাল তথা উত্তম বিষয়ের দিকে আহবান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আসলে তারাই হচ্ছে সফলকাম সম্প্রদায়।" (সূরা-আলে ইমরান:১০৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা যখন, তাদের দ্বারা সৎকাজের আদেশ সংঘটিত হবে বলে সংবাদ দিয়েছেন, তখন প্রাপ্তবয়স্ক লোকগণের নিকট ঐ আদেশ ও নিষেধ যেন পৌঁছে এ ব্যবস্থা করতে হবে। অত:পর যদি তারা গাফলতি করে, তবে তারা এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

অনুরূপভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা নির্দিষ্ট করে প্রত্যেকের উপর বর্তাবে না; বরং পবিত্র কুরআনের প্রমাণ অনুসারে সেটা ওয়াজিব-ই-কিফাইয়াহ।

জিহাদও ঠিক অনুরূপভাবে ওয়াজিব-ই-কিফায়াহ। অতএব সেটার দায়িত্বশীল যখন সেটা সম্পাদনে ব্রতী হবেন না, তখন সকল সামর্থ্য ব্যক্তিগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ দায়িত্ব পালন না করার দোষে সমভাবে দোষী হবেন। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল যে, প্রতিটি মানুষের উপরই তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ দায়িত্ব বর্তাবে। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন:

«من رأى منكم منكرا فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ একটি অসৎকাজ (হতে) দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। তবে যদি সে ঐরূপ করতে অক্ষম হয়, তাহলে কথা দ্বারা যেন তাকে প্রতিহত করে, যদি এরপরও করতে অক্ষম হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করে। আর সেটা হবে সবচাইতে দুর্বল ঈমান।”

(বুখারী: কিতাবুল ‘ইলম; মুসলিম: কিতাবুল ঈমান; আবু দাউদ; বা-বুল আমরি ওয়ান্নাহই; ইবনে মাযাহ: কিতাবুল ফিতান, বাবুল আমরি বিল মা’রূফি ওয়ান্নাহই আনিল মুনকার; আত-তিরমিযী: কিতাবুল রাইয়্যাত, আল-নাসায়ী: কিতাবুল ঈমান; আল-দারিমী: কিতাবুর রূইয়্যা; ইবনে হাম্বাল ২/৪)

যদি বিষয়টি ঐ রকমই হয়, তাহলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, একটি বৃহত্তর সৎকাজ; যার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তার জন্যই বলা হয়েছে- তোমার আদেশ যেন সৎকাজের জন্য হয় এবং অসৎকাজে তোমার নিষেধ করাও যেন সৎ হয়।

যখন এটা সর্বোত্তম ওয়াজিব এবং পছন্দনীয় কাজ, সুতরাং এ ওয়াজিবসমূহ (অপরিহার্য) ও মুস্তাহাবগুলোর সুফল তাদের (প্রয়োগের কারণে) অপকারের চাইতে বেশী ভারি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু এটা সহকারেই রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ

তা‘আলা কখনও ফাসাদ বা অনাসৃষ্টি পছন্দ করেন না। উপরন্ত আল্লাহ যার আদেশ করবেন, তা উত্তমই হবে। আল্লাহ তা‘আলা সৎকাজ ও সৎকর্মীদের প্রশংসা করে বলেছেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ﴿٨٢﴾ ﴾ [البقرة: ٨٢]

“আর যাঁরা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।”(সূরা আল বাকারা:৮২)

আবার ফাসাদ ও ফাসাদকারীদের কুৎসা করেছেন একাধিক স্থানে। অতএব যেখানে আদেশ ও নিষেধের উপকার হতে সেটার অপকারই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেখানে সেটা, আল্লাহ যে সকল বিষয়ে আদেশ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর যদি ঐ রকম হয়ে যায়, তবে যেন ওয়াজিবই ছাড়া হয়ে গেল; আর নিষিদ্ধ কাজই করা হল। এরূপ ক্ষেত্রে মু’মিনের কর্তব্য হলো আল্লাহর বান্দাহদের ব্যাপারে আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করা, তাদেরকে হিদায়াত করা তার দায়িত্ব নয়। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলার কথারই অর্থ বহন করে:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾ [المائدة: ١٠٥]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি সৎপথের যাত্রী হয়েই থাক, তাহলে যারা পথ ভুলে গিয়েছে তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না"- (সূরা আল-মায়িদাহ: ১০৫)।

দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সৎপথের সন্ধানকারী পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি যদি তার করণীয় কাজ কথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে থাকে, যেমন- অন্যান্য ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করে থাকে, তবে পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রাষ্টতা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অসৎকাজ হতে নিষেধ করা কখনও শক্তি দ্বারা হতে পারে, আবার কখনও বা রসনার দ্বারা, আবার কখনও শুধু অন্তরের ঘৃণা দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্তর দ্বারা সেটা করা সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব হবে। যেহেতু সেটা করতে কোনই ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি এতটুকু ঘৃণাও পোষণ করে না সে আসলে মু'মিনই নয়। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হতে এরূপই বুঝা যায়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: وذلك أضعف الإيمان "আর সেটা হল সবচাইতে দুর্বল ঈমান।"

সৎকাজে আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়াহ বলেন,

1. তার কাজ সুষ্ঠু হবে না যদি না সেটা পরিমিত শিক্ষা ও তীক্ষ্মজ্ঞানভিত্তিক হয়।

   যেমন- উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ.) বলেছেন-

   "যে ব্যক্তি বিনা বিদ্যায় আল্লাহর ইবাদত করে, সে যতটুকু ভাল করে, তার চাইতে খারাপই বেশি করে।"

   যেমন- মু'আয ইবন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আছে:

“কাজ করার আগে প্রয়োজন জ্ঞান; কাজের স্থান হল বিদ্যার্জনের পর।” এটা তো একেবারেই স্পষ্ট। কেননা ইচ্ছা করা ও কর্ম সম্পাদন করা যদি জ্ঞানের আলোকেই না হয়, তাহলে সেটাই মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা, সর্বোপরি প্রবৃত্তির অনুসরণ। সুতরাং সৎ ও অসৎকাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মত উপযুক্ত শিক্ষা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এবং যাকে কোন বিষয়ে আদেশ করা হবে বা কোন কাজ হতে নিষেধ করা হবে, তার অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

2. উত্তমভাবে আদেশ বা নিষেধ করা। যেমন, সিরাতাল মুস্তাকীম তথা সরলপথ অনুযায়ী হয়। আসলে সিরাতাল মুস্তাকীম হল- উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অতি দ্রুত পৌঁছাবার মত সংক্ষিপ্ত তথা নিকটতম পথ।
3. সুনম্র ব্যবহার ঐ কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“যে বিষয়েই নম্রতা পাওয়া গেছে তা সে বিষয়কেই সুশোভিত করেছে, আবার যে বিষয়েই খানিকটা কঠোরতা পাওয়া গেছে তা সে বিষয়কেই অশোভিত করেছে- দৃষ্টিকটু করে ফেলেছে”- (মুসলিম: হা: নং- ২৫৯৪)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন-

নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াশীল, প্রত্যেকটি বিষয়েই নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন, নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারের ফলে তিনি যা দান করেন কঠোরতার কারণে তা দেন না।”

(বুখারী: ১২/২৮০, ফাতহুল বারী আলা শারহিল বুখারী, কিতাবুল ইসতিহাবাহ; মুসলিম: কিতাবুসসিয়ার, ৮/২২; আবু দাউদ, কিতাবুল আমওয়াল, ৫/১৫৫; আত-তিরমিযী: ৫/৬০, হা: নং-১৭০১; ইবনে মাজাহ: ২/১২১৬, কিতাবুল আদব-বাবুন ফিররিফক; আল-দারিমী: ২/৩২৩; ইববে হাম্বল: ১/১১২)

4. আদেশ দানকারী বা নিষেধকারীকে অবশ্যই কষ্টে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা, এ কথা সত্য যে, তার উপর বিপদ আসবেই। এমন সময় যদি সে ধৈর্য ধারণই না করে, সহ্যই না করে, তাহলে সে যা ভাল করতে পারত তার চাইতে নষ্টই করে বসবে বেশি। যেমন- লুকমান হাকীম তদীয় তনয়কে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন:

﴿ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧ ﴾ [لقمان: ١٧]

“এবং (হে বৎস)! সৎকাজ আদেশ দান কর এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ কর, (এ কাজ করতে যেয়ে) তোমার উপর যে বিপদ আপতিত হবে তাতে ধৈর্য অবলম্বন কর, নি:সন্দেহে সেটা একটি মহৎ কাজ।” (সূরা লুকমান:১৭)

এজন্যই আল্লাহ তা‘আলার রাসূলগণ, অথচ তাঁরা সৎকাজে আদেশ দানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারীদের নেতা, তাদেরকেও ধৈর্য অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। যেমন- তিনি সর্বশেষ রাসূল

(স.) কে বলেছেন। আসলে সেটা (ধৈর্য) রিসালাতের দায়িত্ব তাবলীগের সাথেই জড়িত। কেননা সর্বপ্রথম যখন তাঁকে (সা) রাসূল হিসেবে গণ্য করা হল, তখনই সূরা 'ইকরা' নাযিল হবার পর (যার মাধ্যমে তাঁকে নাবী বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে) আল্লাহ তাঁকে আদরভরে সম্বোধন করে বলেছেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝٧ ﴾ [المدثر: ١، ٧]

"হে চাদর আচ্ছাদনকারী! উঠুন এবং ভয় প্রদর্শন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার বেশভূষা পবিত্র করুন, অপবিত্রতা (মূর্তি) পরিত্যাগ করুন, আর কাউকেও এ উদ্দেশে দান করবেন না যে, অতিরিক্ত বিনিময় প্রত্যাশা করেন এবং আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশেই ধৈর্য অবলম্বন করুন।" (সুরা আল-মুদ্দাসসির:১-৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সৃষ্টি জগতে প্রেরণের এ আয়াতগুলো ভীতি প্রদর্শনমূলক বিষয় দ্বারাই শুরু

তথা সূচনা করেছেন এবং ধৈর্য ধারনের আদেশ দানের মাধ্যমে শেষ করেছেন। মুলত শাস্তির ভয় প্রদর্শনই হল সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা।

অতএব জানা হয়ে গেল যে, ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব, তথা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন:

﴿ وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ ٤٨ ﴾ [الطور: ٤٨]

"এবং আপনার প্রতিপালকের এ ব্যবস্থার উপর (ফায়সালার অপেক্ষায়) ধৈর্য অবলম্বন করুন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরই দৃষ্টিতে আছেন।"(সূরা আত-তুর:৪৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অন্যত্র আরও বলেছেন:

﴿ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠ ﴾ [المزمل: ١٠]

"তাদের কথায় (বিচলিত না হয়ে বরং) ধৈর্য অবলম্বন করুন এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করুন।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল:১০)

অন্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লা তা'আলা আরও বলেছেন:

﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ۝٣٥ ﴾ [الاحقاف: ٣٥]

"দৃঢ় সংকল্পচিত্ত রাসূলগণের মতই আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন।" (সূরা- আল-আহকাফ:৩৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন:

﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ۝٤٨ ﴾ [القلم: ٤٨]

"আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন এবং (খবরদার) মাছের কাহিনীর সে লোক (ইউনুস) আলাইহিস সালাম এর মতো অধৈর্য হবেন না।" (সূরা আল-কালাম:৪৮)

ধৈর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও বলেছেন:

﴿ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۝١٢٧ ﴾ [النحل: ١٢٧]

ধৈর্য অবলম্ব করতে থাকুন, আসলে আপনার ধৈর্য ধারণ তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য ছাড়া নয়।" (সূরা আন-নাহল:১২৭)

আবার আর এক স্থানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَٱصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١١٥ ﴾ [هود: ١١٥]

“আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কেননা আল্লাহ তা‘আলা নিষ্ঠাবানদের কর্মফল বিলীন অর্থাৎ- নষ্ট করেন না।” (সূরা হূদ:১১৫)

সুতরাং শিক্ষা, নম্রতা ও ধৈর্য-এ তিনটি বিষয় ছাড়া কোন ক্রমেই চলবে না। আদেশ করা বা নিষেধ করার পূর্বেই জ্ঞানের দরকার এবং সে সঙ্গে নম্রতা, আর এটার পরেই প্রয়োজন ধৈর্যের। যদিও এ ত্রিবিধ বিষয়গুলোই সর্বাবস্থাতেই একই সঙ্গে পাওয়া যেতে হবে।

যেমন- সালফে সালিহীনদের কোনো একজনের উক্তি বর্ণনাকারী পরম্পরায় কাজী আবূ ইয়ালা “আল-মু‘তামাদ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

لا يأمرهم با لمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمرهم به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمربه رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمربه حليمافيما ينهى عنه.

“যিনি সৎকাজে আদেশ করবেন ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবেন, তিনি যদি ঐ বিষয়ে সুবিজ্ঞ আলিম তথা ফকীহ না হন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন না। অনুরূপ তিনি যে বিষয়ে আদেশ দিবেন, সে বিষয়ে নম্র হবেন এবং যে বিষয় হতে নিষেধ করবেন সে বিষয়েও নম্র হবেন এবং যে বিষয়ে আদেশ দিবেন সে বিষয়ে তাকে সহিষ্ণু হতে হবে, আবার যে বিষয় হতে নিষেধ করবেন সে বিষয়েও তাকে সহিষ্ণু হতে হবে।” তা না হলে তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে পারবেন না। সে যেন এটাও জেনে রাখে যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার কতগুলো পদ্ধতি তথা নীতি আছে, যার জটিলতা অনেকের উপরই এনে ফেলে। তখন সে ধারণা করে যে, ঐ সকল জটিলতার কারণে সেটা হতে বাদ পড়ে যাবে। ফলে সে এ কাজই ছেড়ে দেয়। সেটা এমন বিষয়সমূহের অন্তর্গত যে,

এ পদ্ধতিগুলো না পাওয়া গেলে তার মূল বিষয়টিকে (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ) ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কেননা অবশ্য করণীয় কাজটি না করাও পাপ। আবার আল্লাহ তা'আলা যা করতে নিষেধ করেছেন সেটা করাও পাপ।

সুতরাং এক পাপ হতে অন্য পাপে জড়িয়ে পড়ার উদাহরণ হল, একটি বাতিল দীন হতে সরে অন্য আর একটি বাতিল দীন গ্রহণ করা। এমন হওয়াও সম্ভব যে, প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টি বেশী মাত্রায় খারাপ, আবার এটার মাত্রা একটু কমও হতে পারে। হয়তো বা দু'টি দীনই খারাপ হিসেবে সমান। সৎকাজে আদেশদানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারী যাদের মধ্যে ক্রুটি পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ভালরূপে দায়িত্ব পালন করতে পারে নি অথবা তাতে সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের কাউকে পাবে যে, এই জনের দোষ সাংঘাতিক বড়, ঐ জনের পাপ সাংঘাতিক ধরনের বড়, আবার হয়তো বা উভয়েই পাপে বরাবর বা একই শ্রেণীভুক্ত।

অসৎ কাজ নিষেধের পদ্ধতি

প্রতিদিন আমরা আমাদের চারপাশে অনেক খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখি। কিন্তু কেউ এ ধরনের কাজে বাধা প্রদান করি না। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ঠিক নয়। কারণ হতে পারে মানুষ ভুলবশত ও গাফেল হিসেবে এসব কাজ করছে। বাধা না থাকলে নির্বিঘ্নে একাজ সংগঠিত হতে থাকলে এক সময় দেশ ও জাতি কেউই এ কাজের কুফল হতে রেহাই পাবে না। প্রকৃত মুসলিম ও সচেতন মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো এ ধরনের কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখা। মুসলিমগণ একদিকে যেমন সৎকাজ করবে, অন্যদিকে অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এ ধরনের সকল উপায় উপকরণ থেকেও মানুষকে সতর্ক করতে হবে। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মদ পান নিষেধ করেন নি বরং তিনি আইয়্যামে জাহেলিয়ার যুগের মদ তৈরী ও রাখার পাত্রসহ যাবতীয় উপকরণকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে একবারে অন্যায়ের মুলোৎপাটন করা অসম্ভব।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে মানুষকে বারণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, ধাপ ও ক্রমান্বয়ের ফর্মূলা গ্রহণ করেছিলেন। মদপান নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে একথাই প্রতিয়মান হয় যে, পর্যায়ক্রমিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কুরআনে মাদকতা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

1. প্রথম পর্যায়ে সূরা আন-নাহলের ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে

﴿ وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ ٦٧ ﴾ [النحل: ٦٧]

'এমনিভাবে খেজুরের গাছ ও আঙ্গুরের ছড়া থেকেও আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকে পরিণত কর। এবং উত্তম পবিত্র পানীয় তাতে রয়েছে।

2. দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াত:

﴿ ۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ ٢١٩ ﴾ [البقرة: ٢١٩]

"হে রাসূল! আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি উভয় সম্পর্কে বলুন, মহাপাপ আর মানুষের জন্য লাভজনক তাদের লাভ থেকে পাপই বড়।"[18]

3. তৃতীয় পর্যায়ে মদকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ٤٣ ﴾ [النساء: ٤٣]

---

[18]সূরা আল বাকারাহ:২১৯।

“হে মুমিনগণ! তোমরা মাতলামির অবস্থায় নামাযের নিকটও যেও না, যতক্ষণ তোমরা যা বল তা জানতে না পার।” (সূরা নিসা: ৪৩)

অত:পর যখন ধর্মীয় অনিষ্ঠতা কোনো কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হলো তখন চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহ তায়ালা মদপান হারাম করে দেন। তিনি বলেন-

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝٩١ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]

হে ইমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, টার্গেট করে পশু বধ করা ও মুর্তির নামে গোশত বন্টন শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে। মনে রেখ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও

হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদেরকে সালাত ও আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখতে ইছুক। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, তোমরা কি একাজ থেকে বিরত থাকবে। (সূরা আল-মায়েদাহ: ৯০-৯১)

রাসূল (স.) অসৎ কাজে বাধা দান করার পদ্ধতি বাতলে দিতে গিয়ে বলেন,

“যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ সংগঠিত হতে দেখে তখন তার কর্তব্য হলো শক্তি দিয়ে এর প্রতিহত করা এতেও যদি যে সামর্থবান না হয় তবে মুখ দিয়ে বাধা দিবে। এক্ষেত্রে যদি সে অসমর্থ হয় তবে অন্তরে খারাপ কাজকে ঘৃনা করবে। আর এটা দুর্বল ঈমানের পরিচয়।”

যখন কোন সমাজে অন্যায় কাজকে অন্যায় বলার মত কোন প্রকৃত মুসলিম না থাকে তখন সে সমাজে সকলের উপর আল্লাহর আযাব ও গজব পতিত হতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ ﴾ [الروم: ٤١]

‘জ্বলে ও স্থলে যেসব বিপর্যয় প্রকাশিত হচ্ছে তা তোমাদের নিজেদের অর্জন। ” (সূরা আর রূম:৪১)

আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষ দু’শ্রেণী

এখানে মানুষের দু’টি দলই ভুল করে থাকে। প্রথম দল: তাদের উপর আদেশ ও নিষেধের যে দায়িত্ব, এ আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে অবহেলা করে ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন প্রথম খলীফা আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এক ভাষণে বলেছিলেন; হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাক-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ﴾ [المائدة: ١٠٥]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ব-স্ব হিদায়াতের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের উপর, তোমরা যদি সৎপথপ্রাপ্ত হও তাহলে যারা বিপথগামী হয়েছে তারা তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না”- (সূরা আল-মায়িদাহ,:১০৫)। অথচ তোমরা সেটার সঠিক অর্থে ব্যবহার করছ না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি “নিশ্চয়ই মানুষ যখন অসৎকাজ চলতে দেখবে,

অথচ সেটাকে প্রতিহত করবে না, এটা বেশী দূরে নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ কাজের দায়ে সকলকেই সাধারণভাবে শাস্তি দিবেন।”

আর দ্বিতীয় দলটি যারা জিহবা বা হাত দ্বারা মোটকথা সৎকাজ আদেশ দিতে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে চায়, কোন প্রয়োজনীয় জ্ঞান, সহনশীলতা বা ধৈর্য ছাড়াই এবং সেটার কোনটি কোথায় চলবে, আর কোথায় চলবে না, কোনটি সে করতে পারবে, আর কোনটি সে করতে পারবে না, সেদিকে লক্ষ্য নেই। যেমন- আবু সা‘আলাবাহ আল-খুশানী বর্ণিত হাদীসে আছে, আমি সেটা (ঐ আয়াতটি) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলাম, এতে তিনি বলেছিলেন:

“বরং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ হতে নিজেদেরকে নিজেরাই নিষেধ করবে। যখন দেখবে এমন কৃপণতা, যা অন্যেরা অনুসরণ করছে এবং অনুসৃত প্রবৃত্তি, প্রভাব বিস্তারকারী পার্থিব ঐশ্বর্য ও প্রত্যেক ‘আলিম ব্যক্তি স্ব-স্ব রায় নিয়েই খুশি হচ্ছে এবং এমন সব অশ্লীল কর্মকান্ড

ঘটতে দেখবে যা ঠেকাবার মত তোমার কোন শক্তি নেই, এমতাবস্থায় ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা ভিত্তিক নিজে নিজেকেই রক্ষা করবে। এমন সময় হলে সর্বসাধারণের চিন্তা-ভাবনা করার তোমার সুযোগ থাকবে না, পারবেও না, কাজেই সেটা বাদ দিও। কেননা তোমার সামনে ধৈর্যের এমন দিন আসবে (তখন কঠিন পরীক্ষা হবে) ঐ দিনগুলোতে ধৈর্যের সাথে ঈমান নিয়ে টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠিতে ধারণের মতোই কঠিন হবে। ঐ কঠিন দিনগুলোতে সৎকাজের কর্মীদের সাওয়াব হবে তার সমতুল্য আমলকারী পঞ্চাশ জন লোকের সৎ আমলের সমান।”

(সহীহ আত-তিরমিযী: কিতাবুল ফিতান, আবওয়াবুল তাফসীর; আবু দাউদ; ৪/১৫২, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরি ওয়াল নাহ-ই)

এমন কঠিন মুহূর্তে কোন একজন আদেশ ও নিষেধ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে এ মনে করে যে, সে নিজে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুগত, আসলে সে নিজেই সীমালঙ্ঘনকারী।

যেমন- অনেক বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির পূজারীগণ নিজেদেরকে সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারী হিসেবে নিজেদের সাজিয়ে রয়েছে। এ সকল লোক ঐ খারিজী, মুতাযিলা, শিয়া-রাফিযী ও অনুরূপ অন্যান্য গোষ্ঠীরই মত, যারা তাদের প্রতি আগত আদেশ ও নিষেধাবলীর ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছে এবং এভাবেই তাদের সংশোধনী কাজের চেয়ে অনাসৃষ্টিই বেশী হয়েছে। (শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়াহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ, সম্পা. আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, পৃ.৬৯)

আদেশ দান ও নিষেধ করার ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণীসমূহ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়াহ এর মতে এক্ষেত্রে মানুষ ত্রিবিধ:

এক. এমন সম্প্রদায় যারা তাদের নাফস সমূহের চাহিদা ব্যতিরেকে তারা কিছুই করবে না। তাদেরকে যা দেয়া হবে, তা ছাড়া তারা সন্তুষ্ট হবে না। আবার তাদেরকে যা হতে বঞ্চিত করা হবে, তা ব্যতীত (অন্য কোন কারণে) তারা রাগও করবে না। আর যখন তাদের কাউকেও তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী, তা হারাম হোক বা হালাল হোক, দেয়া হবে দেখবে তার রোষাগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে সে খুশিও হয়ে গেছে। আর ক্ষণিক পূর্বেও সে বিষয়টি তার নিকট অসৎ ছিল সেটা হতে নিষেধ করত, সেটা করার কারণে শাস্তি দিত, সেটা যে করত তাকে ভৎর্সনা করত, এখন সে স্বয়ং সেটার কর্তাব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা সম্পাদনে সে নিজেও শরীক ও সহযোগী এবং যে সেটা

হতে নিষেধ করবে ও তাকে ঘৃণা করবে তার ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছে।

এরূপ অবস্থা আদম সন্তানদের মধ্যেই বেশি প্রবল। তুমি দেখে থাকবে, মানুষ সেটার ঘটনা এত শুনছে যে, আল্লাহ ছাড়া সেটার পরিসংখ্যান আর কেউ দিতে পারবে না।

কারণ হলো যে, মানুষ আসলে অতিশয় যালিম ও অজ্ঞ। এজন্যই সে ন্যায়বিচার করে না। বরং সে হয়ত বা উভয়বিধ অবস্থাতেই অত্যাচারী। সে কোন রাজার হাতে প্রজা সাধারণের প্রতি অবিচার ও তাদের উপর সীমাহীন নির্যাতনের কারণে কোন সম্প্রদায়কে ঐ সম্প্রদায়ের হর্তাকর্তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে দেখবে। অত:পর ঐ রাজা ঐ সকল অনাস্থাবান লোকদেরকে যৎকিঞ্চিৎ দান-দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করে নিবে, অত:পর তারা ঐ অত্যাচারী রাজার সাহায্যকারী হয়ে বসবে। তাদের অবস্থাসমূহের মধ্যে মজার বিষয় হল যে, তারা ঐ যালিমের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হতেও বিরত (চুপ) থাকবে। অনুরূপভাবে (হে পাঠক) তাদের

কাউকেও কোন মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারীর নিকটে দেখবে এবং গানবাদ্য শুনতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সাথে একত্রে ঐ কাজে প্রবেশ করবে, অথবা সেটার কিছু অংশ দ্বারা তারা তাকে সন্তুষ্ট করে ফেলবে, তখন দেখবে যে, সে তাদের সাহায্যকারী হয়ে গেছে।

দুই. অন্য আর এক সম্প্রদায়, তারা সহীহ দীনী কাজ-কর্মই করে থাকে এবং তাতে তারা একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে এবং যা করে তাতে তারা একনিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং ঐ কাজও তাদের জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে থাকে। এমনকি যে সকল ব্যাপারে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তারা ধৈর্যও অবলম্বন করে থাকে। আর আসলে ঐ সম্প্রদায়ই হল সেসব লোক, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। আর ঐ সকল লোকই তো (উত্তম-উম্মাহ) অতি উত্তম জাতি, যারা মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধনের জন্য সৃজিত হয়েছে। তারাই সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে।

তিন. আর এক সম্প্রদায়, তারা হল মু'মিনদের (বিশ্বাসীদের) বৃহত্তম অংশ। যাদের অন্তরে দীন আছে, আরও আছে কামরিপু, আবার অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের বাসনাও আছে ও ওদিকে অবাধ্যচরণের ইচ্ছাও বিদ্যমান। তাই কখনও এ আকাঙ্খা প্রবল হয়ে যায় আবার কখনও ঐ বাসনা হয় বেশী প্রবল।

এ ত্রিবিধ বণ্টনটা হল যেমন কথিত আছে নাফসসমূহ (আত্মা) তিনটি:

- নাফস আম্মারাহ: যা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।
- লাওয়ামাহ : যা বেশি বেশি ভৎর্সনা করে।
- মুতমাইন্নাহ: যা ভাল কাজে তৃপ্ত থাকে।

তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক তারা যারা নাফসে আম্মারার অধিকারী, যারা কু-কাজের জন্য বেশি আদেশ দিয়ে থাকে। আর মধ্যম দল তারা, যারা নাফসে মুতমাইন্নার অধিকারী, যাকে সম্বোধন করে (কিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে) বলা হবে-

﴿ يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾ ﴾ [الفجر: ٢٧، ٣٠]

"হে নাফসে মুতমাইন্নাহ (অর্থা- শান্তিময় আত্মা) তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল এভাবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট্ এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল ফাজর:২৭-৩০)

আর ঐ সকল লোক হল বেশি ভৎর্সনাকারী আত্মার অধিকারী যারা পাপকাজ করে এবং তজ্জন্য আবার নিজেদের ভৎর্সনাও করে এবং রং-বেরং ধারণ করে। কখনও এরূপ, আবার কখনও বা সেরূপ এবং ভাল কাজসমূহের সাথে খারাপ কাজ মিলিয়ে ফেলে।

আর এজন্যই যখন মানুষ আবু বকর (রা.) ও উমার (রা.) এর যুগে ছিল-তাঁরা দু'জন তো এমন ছিলেন যে, তাঁদের আনুগত্য

তথা অনুসরণ করার জন্য মুসলিমগণকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“হে লোক সকল! আমার (অব্যবহিত) পরেই যে দু’জন আসবেন- আবু বকর ও উমর- তাদের অনুসরণ করো।” (আবু-দাউদ: ৫/১৩: কিতাবুস সুন্নাহ বাবু-ফি লুজুমিস সুন্নাহ; আন-নাসায়ী: ৫-৪৪, হা: নং- ২৬৭৬, কিতাবুল ইলম, বাবু-মাযায়া ফি আল-আখজি বিসসুন্নাহ; ইবনে মাজাহ: ১/১৫, আল-মুকাদ্দিমাহ, বাব-ইত্তিবা-ই-সুন্নাতিল খুলাফা-ইর- রাশিদীন; আল- দারিমী: ১/৪৪, আল-মুকাদ্দিমাহ বাবু ইত্তিবা-ইস সুন্নাহ; ইবনে হাম্মাল: ৪/১২৬-১২৭)

যখন মানুষ রিসালাত (নাবুওয়াতের)-এর অতি নিকটতম যুগে ছিল, ঈমান ও সততার দিক হতে ছিল সুমহান, তখন তাদের নেতৃবর্গও ছিলেন দায়িত্ব পালনে অত্যধিক তৎপর এবং শান্তিময়তার ক্ষেত্রে ছিলেন বেশি স্থির। তখন ফিতনাহ-ফাসাদ ঘটে নি। ঐ সময় তারা মধ্যবর্তী দলের মধ্যে বিবেচিত হতেন।

যখন মানুষ উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষ পর্যায়ে ও আলী (রা.) এর খিলাফাতের সময় ছিল তখন তৃতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যা বর্ধিত হয়ে গিয়েছিল, ঐ সময় মানুষের মধ্যে দীন ও ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকাঙ্খা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা কতিপয় প্রাদেশিক গভর্ণর ও কিছু সংখ্যক প্রজা সাধারণের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর সেটা ক্রমান্বয়ে (আরও বেড়ে) বেশি হয়ে পড়েছিল।

এভাবেই ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণ, শাসক (গভর্নর) ও প্রজা উভয় পক্ষেরই তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আনুগত্য অবলম্বন না করা, শাসক ও প্রজা উভয় শ্রেণির মধ্যেই এক প্রকারের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও গুনাহের প্রতি আকর্ষণের সংমিশ্রণ ঘটা, আর উভয় পক্ষই ছিল মনগড়া ব্যাখার আশ্রয়গ্রহণকারী যে সে সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে থাকে এবং সে সত্য ও ন্যায়নীতির সাথে আছে বলে দাবী করা। অথচ এরূপ মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে এক প্রকারের প্রবৃত্তি অনুসরণের মনোবৃত্তিও রয়েছে। আর এর মধ্যে রয়েছে একটু কিছু সন্দেহ এবং মন যা

চায় তারই আকাঙ্খা পোষণ। যদিও দু‘পক্ষের একপক্ষ সত্যের (খিলাফাতের) জন্য অধিকযোগ্য ছিল।

অতএব বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত হল, সে যেন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার অন্তরকে ঈমান ও আল্লাহভীতি দ্বারা আবাদ করে, অন্তরকে বক্র না করে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও হিদায়াতের উপর স্থির রাখে এবং সে যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, এ সকল বিষয়ে আল্লাহরই উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন-

﴿ فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ١٥ ﴾ [الشورا: ١٥]

“অতএব আপনি সেদিকেই ডাকতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে(তাতে) দৃঢ় থাকুন আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর বলে দিন আল্লাহ যত কিতাব নাযিল

করেছেন আমি তাতে ঈমান আনছি আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠিত রাখি, আল্লাহ আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও মালিক।" (সূরা আশ-শূরা ৪২:১৫)

এটাই হল জাতির অবস্থা ঐ সকল বিষয়ে, যাতে সে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং কথাবার্তা ও ইবাদাতে মতবিরোধ করেছে। এগুলো এমন সব বিষয়ের আওতাভুক্ত যার ফলে মু'মিনদের উপর বিপদাপদ প্রকট হয়ে আসে। সুতরাং তারা দুটি জিনিসের মুখাপেক্ষী:

- নিজেদের থেকে দুনিয়া ও ধর্মীয় ফিতনা, যদ্বারা তাদের অনুরূপ লোকজন (পূর্বেও) পরীক্ষিত হয়েছিল, সেটার কারণ থাকা সত্বেও তা প্রতিহত করা। কেননা তাদের সাথেও রয়েছে নাফসসমূহ ও শয়তান, যেমন রয়েছে অন্যদের সাথেও। ... অনেক এমন লোক আছে যে সে অন্যকে করতে না দেখা পর্যন্ত কোনও ভাল কাজ বা খারাপ কাজ করে না, তারপর অপরের দেখাদেখি সেটা করে বসে।

আর এজন্যই কোন ভাল বা মন্দ কাজের সূচনাকারী (তার) অনুকরণকারীদের সকলের সমান পূর্ণ বা পাপের অধিকারী হবে। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

‘‘যে ব্যক্তি কোনও সুন্দর আদর্শের প্রচলণ করবে সে সেটার প্রতিফল (সাওয়াব) তো পাবেই তদুপরি কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণে আমল করবে তাদের সকলের সম্মিলিত ‘আমলের সাওয়াবও ঐ প্রচলনকারী পাবে(অথচ) ঐ সকল অনুসরণকারীদের সাওয়াবে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন খারাপ আদর্শের প্রচলন করবে সে সেটার ফলে পাপী তো হবেই তদুপরি কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণে আমল করবে তাদের সকলের সম্মিলিত

পাপরাশির পরিমাণ পাপের দায়ীও সে ব্যক্তি হবে, (অথচ) ঐ সকল অনুসরণকারীদের পাপে এতটুকুও ঘাটতি হবে না। (মুসলিম: কিতাবুল 'ইলম: ৮/৬১, কিতাবুল যাকাত: ৩/৮৭, আন- নাসায়ী: ৫/৭৮; ইবনে হাম্বল: ৪/৩৫৭-৩৫৯)

যেহেতু তারা মৌলিক বিষয়ে শরীক হয়েছে এ কারণে। আর যেহেতু কোন জিনিসের জন্য সেটার সমতূল্য জিনিসের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য। কোন জিনিসের অনুরূপ বস্তু তারই দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং যখন এ আহবানকারীদ্বয় শক্তিশালী হবে, তখন যদি আরও দু'জন আহবানকারী এসে তাদের সাথে মিলিত হয়ে সংগঠিত হয়, তবে এ অবস্থায় বিষয়টি কেমন দাঁড়াবে?

অসৎকাজের লোকেরা তাদের অনুসারীদের ভালবাসে

আর সেটা হল এই যে, খারাপ কাজের অনেক লোক তাদেরকেই ভালবাসে, যারা তাদের এ অবস্থায় থাকাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, আর যারা তাদেরকে গ্রহণ করতে পারে নি তাদের প্রতি ঘৃণা

পোষণ করে। এ অবস্থা বাতিল ধর্মগুলোর মধ্যে (দিবালোকের মত) প্রকাশিত। প্রত্যেক জাতির (সম্প্রদায়ের) বন্ধুত্ব তাদের সমমনাদের সাথে, আর যারা তাদের সমমনা নয় তাদের সাথে রয়েছে শত্রুতা। এরূপ অবস্থাই রয়েছে পার্থিব ও প্রবৃত্তির অভ্যাসের বিষয়গুলোতেও। ঐসব অসৎ লোকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ ও প্রবৃত্তির চাহিদায় অংশগ্রহণ করবে। হয়ত: ঐ বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করবে, যেমনটি হয়ে থাকে রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হর্তা-কর্তাগণ ও ডাকাত-ছিনতাইকারী বা অনুরূপপদের বেলায়। অথবা একাত্মতার মাধ্যমে আস্বাদন গ্রহণের নিমিত্তে।

যেমন- মদপানের জন্য জমায়েত হওয়া লোকদের বেলায় প্রযোজ্য আর তারা এটাই পছন্দ করবে যে, তাদের নিকটে যারা উপস্থিত হয়েছে তারা সকলেই যেন মদপান করে। হয়তো তার একাকী শালীনতা তথা ভাল থাকাটি তাদের নিকট ঘৃণার কারণে, সেটা তার হিংসার জন্য, অথবা সে একা ভাল থাকা ব্যক্তি যেন সমাজে তাদের চাইতে উচ্চ স্থান পেতে না পারে সেজন্য এবং তাদেরকে

বাদ দিয়ে লোকেরা যে তারই প্রশংসা করবে অথবা ঐ একাকী ভাল থাকা ব্যক্তির যেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মত কোন যুক্তি প্রমাণ আর না থাকে অথবা সে নিজে তাদেরকে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে এ ভয়ে, অথবা সে ঐ বিষয়টি কারও কাছে তুলে ধরলে সে তাদেরকে শাস্তি দিবে এ ভয়ে, অথবা তারা এ ভাল থাকা লোকটির অনুগ্রহের পাত্র না হয়ে বা তার ভয়ের নীচে তাদের থাকতে না হয় এরূপ অন্যবিধ আরও কারণে তারা সকলেই তাকে এ পথে চলার সাথী করতে চায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ ﴾ [البقرة: ١٠٩]

"কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই একান্ত মনে চায় তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কাফির করে ফেলে, শুধু

তাদের অন্তর্নিহিত হিংসার দরুন, তাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হবার পর।” (সূরা আল-বাকারাহ :১০৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗۖ ٨٩ ﴾ [النساء: ٨٩]

“তারা এ আশা করে যে, যেমন তারা কাফির তদ্রূপ তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা একরূপ সমান হয়ে যাও।” (সূরা আন-নিসা:৮১)

উসমান ইবন আফফান (রা.) বলেছেন:

“ব্যভিচারিণী একান্ত মনে চায়, হায় স্ত্রীলোক সকলেই যদি ব্যভিচার করত!”

আর এ অংশগ্রহণ কখনও কখনও একই পাপকার্যে হয়, যেমন মদপানে অংশগ্রহণ, মিথ্যা বলা, খারাপ বিশ্বাসে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। আবার কখনও বা পছন্দ করে যে, অংশগ্রহণটি যেন খারাপ কাজের কোন এক শ্রেণীতে হয় যেমন- ব্যভিচারী, সে চায়

যে, অন্য সকলেও যেন ব্যভিচার করে। আর চোর চায় যে, অন্যরাও যেন চুরিই করে কিন্তু শুধু সে যার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে ছাড়া এবং যা চুরি করেছে তা সব ছাড়া যেন হয়।

আর দ্বিতীয় কারণটি হল: তারা ঐ ব্যক্তিকে যে পাপ কাজে লিপ্ত আছে সে পাপ কাজে শরীক হতে আদেশ করে থাকে, যদি তাদের সাথে শরীক হয় তো ভাল, অন্যথায় তার সাথে শত্রুতা করবে এবং এমন কষ্ট দিবে যে, সেটা শক্তি প্রয়োগের স্তরে পৌঁছায় বা পৌছায়ও না।

অত:পর ঐ সকল লোক তাদের অশ্লীল কাজে অন্যের যোগদান করা পছন্দ করে অথবা তাকে উক্ত খারাপ কাজ করতে আদেশ করে এবং তারা যা করতে চায় তজ্জন্য তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে (তাকে রাজী বা বাধ্য করার পর) যখন সে তাদের সাথে শরীক হল বা তাদেরকে সহযোগিতা করল বা তাদের আনুগত্য করল তখনই তারা তাকে ত্রুটিপূর্ণ, খাটো বা নিম্নশ্রেণীর মনে করল ও তাকে হালকা জ্ঞান করল এবং ঐ অংশগ্রহণ

করাটাকেই তার বিরুদ্ধে (অন্যান্য ব্যাপারে) প্রমাণ হিসেবে খাড়া করল। পক্ষান্তরে যদি সে তাদের সাথে শরীক না হত তাহলে তারা তার শত্রুতা করত ও তাকে কষ্ট দিত। আর এই তো হল অধিকাংশ ক্ষমতাশীল যালিমদের অবস্থা। ...

এ যা কিছু অসৎকাজের মধ্যে বিদ্যমান সেটার সমতুল্য অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে সৎকাজে বরং সেটা হতেও প্রবল। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা বলেছেন:

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“আর যারা মু’মিন তাদের ভালবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে।”(সূরা আল-বাকারাহ:১৬৫)

কেননা পূণ্য কাজের আহবায়ক স্বভাবতই অধিকতর শক্তিশালী। যেহেতু মানব তাতে আহবায়ক, সে ঈমান ও ইলম, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং আমানত আদায়ের দিকেই আহবান করবে। যদি সে অন্য কাউকেও তারই অনুরূপ করতে পেরে ফেলে,

তাহলে সে সেটার জন্য দ্বিতীয় আরও একজন আহবায়ক হয়ে গেল, বিশেষ করে সে যদি তার সমতুল্য হয়ে থাকে। আর যদি প্রতিযোগিতার সাথে হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। আসলে এটাই হল সুন্দর ও প্রশংসিত বিষয়।

মু'মিনদের মধ্য হতে এমন কাউকেও যদি পাওয়া যায় যিনি তার সাথে একাত্ম হবেন এবং উক্ত (ভাল) কাজের শরীকদেরকে পছন্দ করবেন এবং যদি সে সেটা না করে, তাহলে তাকে ঘৃণা করবেন, তিনি তখন তৃতীয় আর একজন আহবায়ক হয়ে যাবেন।

আর যদি তারা তাকে ঐ কাজ করতে আদেশ দেয়, সেটা করতে সহযোগিতা করে, সেটা না করার ফলে তার সাথে তার শত্রুতা করে এবং তাকে শাস্তি দেয় সে তখন তার জন্য চতুর্থ আহবায়ক হবে। তাকে এখন তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী এ চার প্রকার আহবায়ক সকলে একত্রিতভাবে অন্যকে সংশোধন করতেও আদেশ দেয়া হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন:

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر: ١، ٣]

"যুগের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে থাকে" (সূরা আল-আসর:১-৩)

ইমাম শাফিঈ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন-"হায়, যদি সকল মানুষ (শুধু) সূরা আল-আসরের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করত তবে সেটাই তাদের মঙ্গল বিধানে যথেষ্ট হত।" বিষয়টি আসলে তিনি যেমন বলেছেন তেমনই। কেননা আল্লাহ উক্ত সূরায় সংবাদ দিয়েছেন যে, সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও বিশ্বাসী এবং অন্যের সাথে (সামাজিকভাবে) সত্যের দিকে উপদেশ দানকারী, ধৈর্যের জন্য উপদেশ দানকারী (সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।